



GILLETTE PRESIDENT & CEO

Ferdinando Frega — Nando the Scribe

GILLETTE প্রেসিডেন্ট ও সিইও

কোম্পানি যত বড়, যত বেশি বাজারে তার কারবার, তার পণ্যের সম্ভার যত বিস্তৃত, আপাতবিরোধী শোনাতে, চেয়ারম্যানের সরাসরি দায়িত্ব যেন ততই কম।

কথাটা উসকানিমূলক শোনাতে পারে, কিন্তু প্রায়ই ব্যাপারটা ঠিক এভাবেই চলে।

বড় কোনো বহুজাতিককে লোকে যখন বাইরে থেকে দেখে, তারা চেয়ারম্যানকে জাহাজের নিরঙ্কুশ কাপ্তেন বলে কল্পনা করে। বাস্তবে, আধুনিক কর্পোরেশনে চেয়ারম্যান প্রায়ই প্রতিনিধিত্ব করেন প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের, ধারাবাহিকতার, আর পরিচালনা পর্ষদ ও শেয়ারহোল্ডারদের সঙ্গে সম্পর্কের।

রোজ সকালে যিনি সত্যিই রণক্ষেত্রে পা রাখেন, তিনি অন্য একজন: সিইও।

সিইওকেই ফলাফল এনে দিতে হয়।

সিইওকেই বোঝাতে হয়, বিক্রি কেন বাড়ছে বা কমছে।

সিইওকেই বাজারের অংশ হারানোর কৈফিয়ত দিতে হয়।

সিইওকেই সামলাতে হয় ধর্মঘট, শিল্প-সংকট, পণ্য ফিরিয়ে নেওয়া, কৌশলগত ভুল আর সাংগঠনিক রদবদল।

এক কথায়, সিইও বাঁচেন নিরন্তর নজরদারির নিচে।

প্রতিটি ত্রৈমাসিক রায় নিয়ে আসে।

প্রতিটি বছর মূল্যায়ন নিয়ে আসে।

প্রতিটি সিদ্ধান্তের একটা দাম আছে।

সব ঠিকঠাক চললে কৃতিত্ব ভাগ হয়।

সব খারাপ গেলে দায় সাধারণত গিয়ে পড়ে একটিমাত্র টেবিলে।

সিইওর টেবিলে।

অন্যদিকে, চেয়ারম্যান বিচরণ করেন আরও পরিশীলিত এক এলাকায়।

চেয়ারম্যান কৌশলগত সিদ্ধান্তে অংশ নেন।

চেয়ারম্যান দিক ঠিক করতে সাহায্য করেন।

চেয়ারম্যান অগ্রাধিকারে প্রভাব ফেলেন।

চেয়ারম্যান শেয়ারহোল্ডারদের সঙ্গে কথা বলেন।

চেয়ারম্যান সম্পর্ক গড়েন।

চেয়ারম্যান ভারসাম্য আর ক্ষমতার কাঠামো সামলান।

অথচ চেয়ারম্যানকে কাজের সামনের সারিতে কদাচিৎ দেখা যায়।

এ ভূমিকা বাস্তবায়নের চেয়ে বেশি প্রভাবের ওপর গড়া।

সরাসরি জবাবদিহির চেয়ে বেশি দিকনির্দেশের ওপর।

খোলা ময়দানে দাঁড়ানোর চেয়ে বেশি ক্ষমতার ওপর।

এই কারণেই, বড় কর্পোরেশনে চেয়ারম্যান আর সিইওর সম্পর্ক গোটা ব্যবস্থার সবচেয়ে নাজুক সমীকরণগুলোর একটি।

কাগজে-কলমে তাঁরা মিত্র বলেই মনে হয়।

বাস্তবে তাঁরা প্রায়ই আলাদা আলাদা প্রয়োজন মেটান।

চেয়ারম্যান প্রতিষ্ঠানটাকে রক্ষা করতে চান।

সিইওকে রক্ষা করতে হয় পারফরম্যান্স।

চেয়ারম্যান ভাবেন স্থিতির হিসাবে।

সিইও ভাবেন ফলাফলের হিসাবে।

চেয়ারম্যান অপেক্ষা করতে পারেন।

সিইওকে জবাব দিতে হয় এক্ষুনি।

দুই ভূমিকা যখন এক সুরে বাঁধা, সংগঠন আরও শক্তিশালী হয়।

সংঘাত দেখা দিলে গোটা কোম্পানি দ্রুত সেই টান টের পায়।

নির্বাহীরা আর বোঝেন না কাকে অনুসরণ করবেন।

অগ্রাধিকার ঝাপসা হয়ে যায়।

সিদ্ধান্তের গতি কমে আসে।

বাজারের প্রতিযোগিতার জায়গা নিতে শুরু করে ভেতরের রাজনীতি।

আর প্রায়ই শেষ পর্যন্ত দামটা চোকান সিইও-ই।

খুব সহজ একটা কারণে।

একটা পরিচালনা পর্ষদ কয়েক মিনিটেই একজন সিইওকে বদলে দিতে পারে।

একজন চেয়ারম্যানকে বদলানো ঢের বেশি জটিল।

এই জন্যই বড় কর্পোরেশনের সিইওর অবস্থান অনন্য।

সিইও বিপুল দায়িত্ব বহন করেন।

সিইও হাজার হাজার মানুষকে চালান।

সিইও শত শত কোটি ডলার নাড়াচাড়া করেন।

সিইও এমন সিদ্ধান্ত নেন, যা গোটা গোটা বাজারে প্রভাব ফেলে।

তবু পদটা সব সময়ই সাময়িক।

একদিন সিইওকে সাফল্যের স্থপতি বলে মাথায় তোলা হতে পারে।

কয়েক ত্রৈমাসিক পরে সেই একই সিইও হয়ে উঠতে পারেন কোম্পানির সমস্যার প্রধান ব্যাখ্যা।

এদিকে চেয়ারম্যান প্রায়ই ব্যবস্থার স্থিতি আর ধারাবাহিকতার প্রতিনিধি।

একজন বাস্তবায়ন করেন।

অন্যজন তদারক করেন।

একজন ছোটেন।

অন্যজন দেখেন।

একজন ফলাফল এনে দেন।

অন্যজন ক্ষমতা রক্ষা করেন।

আর এই ভঙ্গুর ভারসাম্যের ভেতরেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে কর্পোরেট ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে কম আলোচিত সত্যগুলোর একটি:

বড় কর্পোরেশনে ক্ষমতা আর জবাবদিহি সব সময় একই দপ্তরে বসে না।

ফের্দিনান্দো